ICT OLYMPIAD®
BANGLADESH
Empowering Future with Technology

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি
সাধারণ ধারণা

SEASON 3

উৎসর্গ

আইসিটি অলিম্পিয়াড - এ সংশ্লিষ্ট সকলকে

মুখবন্ধ

আধুনিক যুগে সমাজ গঠন এবং প্রত্যাশিত উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। এ প্রযুক্তিকে ইংরেজিতে 'ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি (Information and Communication Technology) বলা হয়। সংক্ষেপে আইসিটি (ICT) নামে পরিচিত।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বা আইসিটির মাধ্যমে উন্নত জীবন যাপন, মানব কল্যাণ, সম্পর্ক উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিচালনা এবং জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণ করা সম্ভব। এর মাধ্যমে বর্তমানে পৃথিবী গ্লোবাল ভিলেজে পরিণত হয়েছে। আমরা অনেকেই জানি, চতুর্থ শিল্পবিপ্লব বা ফোর্থ ইন্ডাস্ট্রি রেভুল্যশন হলো আধুনিক স্মার্ট প্রযুক্তি ব্যবহার করে চলমান উৎপাদন এবং শিল্প ব্যবস্থার স্বয়ংক্রিয়করণের সমসাময়িক সংস্করণ। বর্তমানে বিশ্বব্যাপী বহুল আলোচিত বিষয়গুলোর মধ্যে এটি একটি অন্যতম।

ইন্টারনেটের আবির্ভাবে তৃতীয় শিল্পবিপ্লবের সময় তথ্যপ্রযুক্তির সহজ ও দ্রুত বিনিময় শুরু হয়। ফলে ম্যানুয়াল জগৎ ছেড়ে যাত্রা শুরু হয় ভার্চুয়াল জগতের। চতুর্থ শিল্পবিপ্লব এই ভার্চুয়াল জগতেরই আরও বিস্তৃত পরিসর। যেখানে মানুষের আয়ত্তে থাকবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং ইন্টারনেট অব থিংস বা যন্ত্রের ইন্টারনেট। যা সম্পূর্ণভাবেই মানব-সম্পদের বিকল্প হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে!

চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের ফলে সৃষ্ট নতুন সম্ভাবনার বিপরীতে নানান ঝুঁকিও তৈরি হবে। ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের (ডব্লিউইএফ) দাবি অনুযায়ী, ২০৩০ সালের মধ্যে বিশ্বব্যাপী প্রায় ৮০০ মিলিয়ন মানুষ চাকরি হারানোর ঝুঁকিতে পড়বে। প্রযুক্তিগত দক্ষতার অভাবে প্রায় ৭.৫ মিলিয়ন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বাংলাদেশি বিদেশে তাদের চাকরি থেকে বরখাস্ত হতে পারে। বাংলাদেশও চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের দ্বারপ্রান্তে রয়েছে। তাই সংকট এড়াতে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার বিকল্প নেই।

আইসিটি শিক্ষা গ্রহণ দক্ষ জনশক্তি তৈরিতে সহায়তা করবে, উচ্চ শিক্ষার জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করবে, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সমস্যা সমাধানের উপায় খুঁজে বের করবে, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারের চাহিদা অনুযায়ী দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলতে সাহায্য করবে।

তাই আমাদের লক্ষ্য, দক্ষ জনশক্তি তৈরির কার্যক্রম স্কুল থেকেই শুরু হোক। তা না হলে বিশ্বের সাথে তাল মেলাতে আমরা হিমশিম খেয়ে যাব। আমাদের আগামী প্রজন্ম উপযুক্ত হয়ে গড়ে উঠবে না। সেই লক্ষ্যে এই বইটিতে আমরা আইসিটির গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয় শিশুদের উপযোগী করে তুলে ধরেছি।

আইসিটি বিষয়ক জ্ঞানের তৃষ্ণা বাড়াতে বইটি সহায়ক হবে ঠিকই, তবে এই বইটিই যথেষ্ট নয়। বিষয়গুলো আরও গভীরভাবে জানতে বা চর্চা করতে হলে অবশ্যই আইসিটি বিষয়ে আরও গভীরভাবে অধ্যয়ন করতে হবে। মনে রাখতে হবে, আগামী প্রজন্মকে সঠিক দিকনির্দেশনায় পরিচালিত করতে পারলেই কেবল দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব হবে।

ICT OLYMPIAD BANGLADESH

SEASON 3

আইসিটি সংক্রান্ত সাধারন জ্ঞান (General ICT Knowledge)

Contents

বর্তমান সময়ের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি 3

আইসিটি পরিচিতি 4

আইসিটি ভোকাবুলারী 5

অ্যাব্রিভিয়েশন (Abbreviation) 5

আইসিটির ইতিহাস 11

আইসিটি বিষয়ক বিশেষ ব্যক্তিত্ব 13

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (ICT) এর প্রযুক্তিগত ভিত্তি 14

এনালগ কম্পিউটার ও ডিজিটাল কম্পিউটারের বর্ণনা 18

ইন্টারনেট 19

ইন্টারনেটের উপাদান 19

ইন্টারনেট ব্যবহারের প্রাথমিক ধারণা 20

ই-লার্নিং ও বাংলাদেশ 21

ই-গভর্ন্যান্স ও বাংলাদেশ 23

ই-কমার্স ও বাংলাদেশ 24

সামাজিক যোগাযোগ ও আইসিটি 25

বিনোদন ও আইসিটি 26

ইন্টারনেট কীভাবে কাজ করে? 28

ই-মেইল 29
তথ্য আদান-প্রদানের ঝুঁকি 31
আইসিটির সুবিধা, চ্যালেঞ্জ ও ভবিষ্যৎ 34

বর্তমান সময়ের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি

গত শতাব্দীতে সম্পদের যে ধারণা ছিল, একুশ শতকে এসে সেটি একেবারে নতুন আঙ্গিকে রূপান্তরিত হয়েছে। আজকের পৃথিবীজুড়ে সবাই একমত যে, একুশ শতকের প্রকৃত সম্পদ হল জ্ঞান। এর অর্থ হলো, কৃষি, খনিজ সম্পদ, শক্তির উৎস, শিল্প কিংবা বাণিজ্য – এই সব কিছুই এখন পৃথিবীর মূল সম্পদ নয়। বরং এখন মানবসম্পদ, বিশেষ করে মানুষের জ্ঞান, ক্ষমতা এবং সৃজনশীলতা পৃথিবীর সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ। কারণ, শুধু মানুষই জ্ঞান অন্বেষণ, ধারণ এবং প্রয়োগ করার সক্ষমতা রাখে। এই নতুন ধারণাটি পৃথিবীজুড়ে মানুষের চিন্তাভাবনা, দৃষ্টিভঙ্গি এবং দিশা পুরোপুরি পরিবর্তন করে দিয়েছে। আজকের পৃথিবী এক নতুন বাস্তবতায় দাঁড়িয়ে, যেখানে একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য মানুষ এখন সক্রিয়ভাবে প্রস্তুতি নিচ্ছে।

আমরা সবাই এখন স্পষ্টভাবে অনুভব করছি যে, একুশ শতকের পৃথিবী আসলে একটি জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতির দিকে প্রবাহিত হচ্ছে। এই পরিবর্তনের সঙ্গে আরও দুটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবণতা উদ্ভূত হয়েছে- একটি হচ্ছে Globalization, আর অন্যটি Internationalization। এই দুটি প্রবণতার বিকাশের মূল চালিকা শক্তি হচ্ছে আধুনিক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (ICT)। বিশ্বায়ন এবং আন্তর্জাতিকীকরণের মাধ্যমে, দেশগুলোর ভৌগলিক সীমানা এখন আর সীমাবদ্ধ নয়। একটি দেশের অভ্যন্তরে ঘটে যাওয়া ঘটনা বা উন্নয়ন দ্রুত অন্য দেশে পৌঁছে যাচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ, আমাদের বাংলাদেশে লক্ষ লক্ষ মানুষ এখন বিশ্বের নানা প্রান্তে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছেন। যেখানে তারা আছেন, সেই স্থানটি বাংলাদেশের একটি অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এইভাবে, বাংলাদেশের সীমানা কেবল ভৌগলিকভাবে নয়, বরং সাংস্কৃতিক এবং সামাজিকভাবে অনেক সম্প্রসারিত হয়েছে। একই সঙ্গে, বাংলাদেশী নাগরিকরা পৃথিবীর অন্যান্য দেশের নাগরিক হয়ে সেখানে জীবনযাপন করছে, আর এই আন্তর্জাতিকীকরণ এখন আমাদের নতুন পৃথিবীর অলিখিত নিয়মে পরিণত হয়েছে।

এই পরিবর্তনগুলোর মাধ্যমে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, একুশ শতকের নতুন পৃথিবী এবং এর সম্ভাবনাগুলি মূলত একটি নতুন জ্ঞানভিত্তিক সমাজের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, যেখানে সবার কাছে জ্ঞানই সবচেয়ে শক্তিশালী সম্পদ হয়ে উঠছে।

আমরা জানি, এক সময় পৃথিবীর মানুষকে বেঁচে থাকার জন্য পুরোপুরি প্রকৃতির উপর নির্ভর করতে হত। তবে মানুষ সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন যন্ত্র আবিষ্কার করে প্রকৃতির ওপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে এনেছে। অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে শিল্প বিপ্লবের পর মানুষ যন্ত্রের সাহায্যে পৃথিবীর অর্থনীতির গতি নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়েছিল। যারা শিল্প বিপ্লবে অংশ নিয়েছিল, এক সময় তারাই পৃথিবীকে প্রভাবিত করেছে। আজ, একুশ শতকে, যখন জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতির সূচনা হয়েছে, সেই একই প্রবণতা আবারও দৃশ্যমান হচ্ছে। যারা এই জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গঠনের বিপ্লবে অংশ নেবে, তারাই পৃথিবীর চালিকাশক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে।

এই নতুন বিপ্লবে অংশ নিতে হলে, আমাদের একটি নির্দিষ্ট ধরনের প্রস্তুতি নিতে হবে, যা এখন আরও স্পষ্টভাবে বুঝতে পারা যাচ্ছে। বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতাগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো: পারস্পারিক সহযোগিতার মনোভাব, যোগাযোগ দক্ষতা, সুনাগরিকত্ব, সমস্যা সমাধানের দক্ষতা, বিশ্লেষণী চিন্তা (Critical Thinking), সৃজনশীলতা এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে পারদর্শিতা।

বিশেষভাবে, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে (আইসিটি) দক্ষতা এখন সবচেয়ে প্রয়োজনীয় দক্ষতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। একুশ শতকে টিকে থাকতে হলে, আমাদের সকলকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির মৌলিক বিষয়গুলি জানতে হবে। এই মৌলিক জ্ঞান থাকলেই একজন ব্যক্তি প্রযুক্তি ব্যবহার করে আধুনিক বিশ্বের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রবেশ করতে সক্ষম হবে। একজন শিক্ষার্থী যতক্ষণ পর্যন্ত এই প্রযুক্তির ব্যবহার ও প্রক্রিয়ায় অভ্যস্ত না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ, সংযোজন এবং মূল্যায়ন করে নতুন জ্ঞান সৃষ্টি করতে পারবে না। এই দক্ষতা না থাকলে, সে একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে জ্ঞানভিত্তিক সমাজে নিজেদের অবস্থান তৈরি করতে সক্ষম হবে না।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) হলো এমন একটি ক্ষেত্র যা কম্পিউটার এবং টেলিযোগাযোগ প্রযুক্তির সমন্বয়ে তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ, বিশ্লেষণ এবং বিতরণ করার কাজ করে। এর ইতিহাস বহু দশক ধরে বিস্তৃত, এবং এটি বর্তমানে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই অধ্যায়ে আমরা আইসিটির ইতিহাস, এর উন্নয়ন পর্যায় এবং এর সাথে সম্পর্কিত মৌলিক জ্ঞান সম্পর্কে আলোচনা করব।

আইসিটি পরিচিতি

আইসিটি, বা তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, বর্তমান যুগের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এটি কম্পিউটার প্রযুক্তি, নেটওয়ার্কিং, টেলিযোগাযোগ, ইন্টারনেট এবং অন্যান্য ডিভাইস এবং অ্যাপ্লিকেশনগুলির সমন্বয়ে গঠিত। এর মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ এবং বিনিময় করা যায়, যা আধুনিক সমাজে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

আইসিটি ভোকাবুলারী

প্রযুক্তির কথা উঠলে 'আইসিটি'-এই শব্দটিও যেন অবধারিত ভাবে উঠে আসে। তোমরাও নিশ্চয়ই আইসিটি'র কথা শুনেছো! ইনফরমেশন এন্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি-কে সংক্ষেপে আইসিটি (ICT) বলা হয়। এর অর্থ হলো তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি। আর ভোকাবুলারি শব্দের অর্থ হলো শব্দকোষ। শব্দকোষ, অভিধান বা ডিকশনারি যেটাই বলো না কেনো, প্রচুর শব্দের সমাহারই আসলে ভোকাবুলারি। তাই আমরা বলতে পারি, আইসিটি ভোকাবুলারি হলো এমন একটি অভিধান যার মধ্যে আইসিটি বিষয়ক সকল শব্দের অর্থ, বর্ণনা এবং ব্যবহারের উল্লেখ আছে।

অ্যাব্রিভিয়েশন (Abbreviation)

তোমরা কি অ্যাব্রিভিয়েশন (Abbreviation) সম্পর্কে কিছু জানো? কোনো একটি নামকে (Noun) ছোট করে উপস্থাপন করাকে অ্যাব্রিভিয়েশন বলে। যে কোনো শব্দকে তোমরা ছোট করে লিখে প্রকাশ করতে চাইলে অ্যাব্রিভিয়েশন-এর মাধ্যমে সেটি করতে পারবে। এটি খুবই মজার। সেজন্য কী করতে হবে জানো? সংক্ষেপিত শব্দটির প্রথম অক্ষরের পর একটি ডট (. এই চিহ্নকে ডট বলে) ব্যবহার করতে হবে। যেমন ধরো- তুমি Home Work -এর অ্যাব্রিভিয়েশন করতে চাও। তাহলে তোমাকে H.W. এভাবে লিখতে হবে। কি, মজার না?

একটি বিষয় খেয়াল করবে ICT বিষয়ক Abbreviation -এর ক্ষেত্রে কিন্তু ডটের ব্যবহার না করলেও চলে। চলো তাহলে ICT বিষয়ক কিছু Abbreviation শিখে নেওয়া যাক:

S.No.	Abbreviation	Full Form of ICT Abbreviation
1.	AGP	Accelerated Graphics Port
2.	PC	Personal Computer
3	GPU	Graphics Processing Unit
4.	BIOS	Basic Input and Output System
5.	HDD	Hard Disk Drive
6.	PCI	Peripheral Component Interconnect
7.	UNIVAC	Universal Automatic Computer
8.	GUI	Graphical User Interface
9.	USB	Universal Serial Bus
10.	VGA	Video Graphics Array
11.	MAN	Metropolitan Area Network
12.	ASCII	American Standard Code for Information Interchange
13.	WAN	Wide Area Network
14.	API	Application Programming Interface
15.	LAN	Local Area Network
16.	PSU	Power Supply Unit
17.	CPU	Central Processing Unit
18.	OS	Operating System
19.	ALU	Arithmetic Logic Unit
20.	DVD	Digital Versatile Disc
21.	CD	Compact Disk

22.	ROM	Read Only Memory
23.	VDU	Visual Display Unit
24.	RAM	Random Access Memory
25.	ICT	Information & Communication Technology
26.	PROM	Programmable Read Only Memory
27.	URL	Uniform Resource Locator
28.	IDE	Integrated Development Environment
29.	HDMI	High-Definition Multimedia Interface
30.	MOS	Metal oxide Semi-Conductor
31.	ATX	Advanced Technology Extended
32.	SIM	Subscriber Identification Module
33.	MHz	Megahertz
34.	ISP	Internet Service Provider
35.	GHz	Gigahertz
36.	DBMS	Database Management System
37.	SQL	Structured Query Language
38.	LCD	Liquid Crystal Display
39.	AI	Artificial Intelligence
40.	CAN	Campus Area Network
41.	SIMMs	Single In line Memory Module
42.	PAN	Personal Area Network
43.	DIMM	Dual In line Memory Module

44.	CMOS	Complimentary Metal oxide Semi-Conductor
45.	ENIAC	Electronic Numerical Integrator and Computer
46.	CMD	Command
47.	PDF	Portable Document Format
48.	MAC	Media Access Control
49.	IC	Integrated Circuit
50.	LSIC	Large Scale Integrated Circuit
51.	DIR	Directory
52.	GIGO	Garbage In Garbage Out
53.	PHP	PHP Hypertext Preprocessor
54.	DOC	Document
55.	PDT	Parallel Data Transmission
56.	PDA	Personal Digital Assistant
57.	XLS	Microsoft Excel Spreadsheet
58.	WWW	World Wide Web
59.	SSD	Solid State Drive
60.	CCNP	Cisco Certified Network Professionals
61.	SATA	Serial Advanced Technology Attachment
62.	CEH	Certified Ethical Hacking
63.	TCP	Transmission Control Protocol
64.	CSS	Cascading Style Sheet
65.	IoT	Internet of Things

66.	XSS	Cross Site Scripting
67.	XML	Extensible Markup Language
68.	HTML	Hypertext Markup Language
69.	Wi-Fi	Wireless Fidelity
70.	RFI	Remote File Inclusion
71.	HTTP	Hypertext Transfer Protocol
72.	DDOS	Distribution Denial of Service
73.	VPN	Virtual Private Network
74.	SEO	Search Engine Optimization
75.	IP	Internet Protocol
76	SMTP	Simple Mail Transfer Protocol
77	FTP	File Transfer Protocol
78	SSH	Secure Shell
79	IPP	Internet Printing Protocol
80	POP3	Post Office Protocol 3
81	IMAP	Internet Message Access Protocol
82	DNS	Domain Name System
83	DHCP	Dynamic Host Configuration Protocol
84	Wi-Fi	Wireless Fidelity
85	LAN	Local Area Network

86	VPN	Virtual Private Network
87	WAP	Wireless Application Protocol
88	NFC	Near Field Communication
89	HTML5	Hypertext Markup Language 5
90	JSON	JavaScript Object Notation
91	RSS	Really Simple Syndication
92	AJAX	Asynchronous JavaScript and XML
93	SaaS	Software as a Service
94	PaaS	Platform as a Service
95	IaaS	Infrastructure as a Service
96	BYOD	Bring Your Own Device
97	API	Application Programming Interface
98	CI	Continuous Integration
99	CRM	Customer Relationship Management
100	ERP	Enterprise Resource Planning

আইসিটির ইতিহাস

আইসিটির ইতিহাস বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্যে দিয়ে গেছে, যা প্রযুক্তির বিকাশ এবং মানব সভ্যতার অগ্রগতির সাথে সম্পর্কিত। নিম্নলিখিত ধাপগুলোতে এর ইতিহাস বর্ণনা করা যায়:

১. প্রারম্ভিক যুগ (১৮০০-এর দশক)

চার্লস ব্যাবেজ: ১৮৩৭ সালে চার্লস ব্যাবেজ ডিফারেন্স ইঞ্জিন এবং পরে অ্যানালাইটিকাল ইঞ্জিন আবিষ্কার করেন, যা প্রথম মেকানিক্যাল কম্পিউটার হিসেবে বিবেচিত হয়।

হার্মান হোলেরিথ: ১৮৮০-এর দশকে হার্মান হোলেরিথ ট্যাবুলেটিং মেশিন তৈরি করেন, যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আদমশুমারি সম্পন্ন করতে ব্যবহৃত হয়।

২. মধ্যযুগ (১৯৩০-১৯৬০)

- **অ্যালান টুরিং:** ১৯৩৬ সালে অ্যালান টুরিং তার টুরিং মেশিন ধারণা প্রস্তাব করেন, যা আধুনিক কম্পিউটার বিজ্ঞান এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ভিত্তি স্থাপন করে।
- **ENIAC :** ১৯৪৫ সালে ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer) তৈরি হয়, যা প্রথম সাধারণ উদ্দেশ্য ইলেকট্রনিক ডিজিটাল কম্পিউটার ছিল।

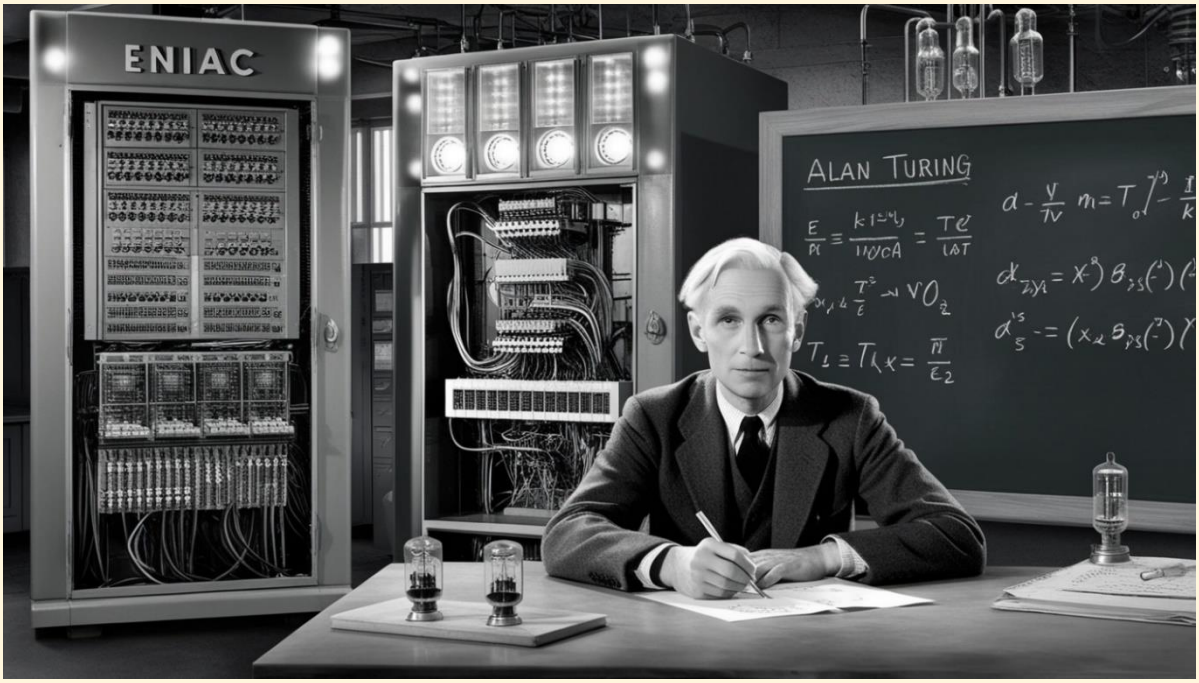

৩. আধুনিক যুগ (১৯৭০-বর্তমান)

- **ইন্টারনেট :** ১৯৬৯ সালে ARPANET নামে প্রথম ইন্টারনেট তৈরি হয়। পরে এটি বিকশিত হয়ে ১৯৯০-এর দশকে ইন্টারনেট নামে পরিচিতি লাভ করে।

- **পার্সোনাল কম্পিউটার (PC) :** ১৯৭০-এর দশকে অ্যাপল, আইবিএম এবং মাইক্রোসফ্টের মতো কোম্পানিগুলির মাধ্যমে পার্সোনাল কম্পিউটারের বিকাশ ঘটে।

আইসিটি বিষয়ক বিশেষ ব্যক্তিত্ব

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির বিকাশের পেছনে রয়েছে অনেক বিজ্ঞানী, ভিশনারি, প্রকৌশলী ও নির্মাতাদের অবদান। এমন কয়েকজন বিশেষ ব্যক্তির পরিচয় জানা যাক।

চার্লস ব্যাবেজ : আধুনিক কম্পিউটারের বিকাশ বা প্রচলন শুরু করেন ইংরেজ প্রকৌশলী ও গণিতবিদ চার্লস ব্যাবেজ (১৭৯১-১৮৭১)। তাকে আধুনিক কম্পিউটারের জনকও বলা হয়। তিনি ডিফারেন্স ইঞ্জিন তৈরি করেন। ১৮৩৩ সালে তিনি সর্বপ্রথম অ্যানালটিক্যাল ইঞ্জিন নামে একটি যান্ত্রিক কম্পিউটার তৈরির পরিকল্পনা ও ইঞ্জিনের নকশা করেন। চার্লস ব্যাবেজের বর্ণনা অনুসারে, ১৯৯১ সালে লন্ডনের বিজ্ঞান জাদুঘরে ইঞ্জিনটি তৈরি হয়। পরে দেখা গেছে, সেটি সঠিকভাবেই কাজ করছে।

অ্যাডা লাভলেস : গণনার কাজ কীভাবে আরও কার্যকর করা যায়, সেটি নিয়ে ভেবেছিলেন কবি লর্ড বায়রনের মেয়ে অ্যাডা লাভলেস (১৮১৫-১৮৫২)। মায়ের কারণে অ্যাডা ছোটবেলা থেকে বিজ্ঞান ও গণিতে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। ১৮৩৩ সালে চার্লস ব্যাবেজের সঙ্গে তার পরিচয় হলে তিনি ব্যাবেজের এনালিটিক্যাল ইঞ্জিনকে কাজে লাগানোর জন্য 'প্রোগ্রামিং' -এর ধারণা সামনে নিয়ে আসেন। এ কারণে অ্যাডা লাভলেসকে প্রোগ্রামিং ধারণার প্রবর্তক বলা হয়।

টিমোথি জন টিম বার্নাস-লি : ইন্টারনেটের বিকাশকালে ১৯৮৯ সালে একজন ব্রিটিশ কম্পিউটার বিজ্ঞানী হাইপারটেন্ট ট্রান্সফার প্রটোকল ব্যবহার করে তথ্য ব্যবস্থাপনার প্রস্তাব করেন এবং তা বাস্তবায়ন করেন। সেই থেকে স্যার টিমোথি জন টিম বার্নাস-লি বিশ্বে ওয়েবের জনক হিসেবে পরিচিত।

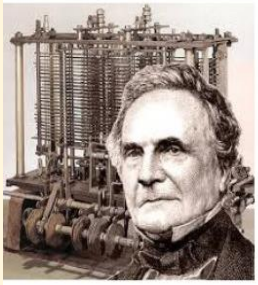

Charles Babbage

Ada Lovelace

Alan Turing

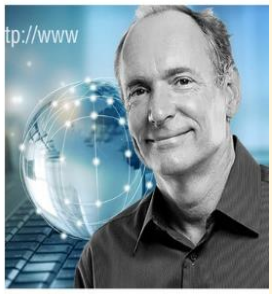

Tim Berners-Lee

Bill Gates

Steve Jobs

Mark Zukerberg

স্টিভ জবস : স্টিভ জবস (১৯৫৫-২০১৯) ও তার দুই বন্ধু (স্টিভ জজনিয়াক ও রোনাল্ড ওয়েন) ১৯৭৬ সালের ১ এপ্রিল অ্যাপল কম্পিউটার নামে একটি প্রতিষ্ঠান চালু করেন। বর্তমানে বিশ্বের যা অন্যতম বৃহৎ প্রতিষ্ঠান। অ্যাপলের হাতেই পার্সোনাল কম্পিউটারের নানান পর্যায় বিকশিত হয়েছে।

বিল গেটস : উইলিয়াম হেনরি বিল গেটস ও তার দুই বন্ধু মিলে মাইক্রোসফট প্রতিষ্ঠা করেন। এমএস ডস এবং উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেম বিকশিত হয়। বর্তমানে পৃথিবীর অধিকাংশ কম্পিউটার পরিচালিত হয় মাইক্রোসফট কোম্পানির অপারেটিং সিস্টেম সফটওয়্যার দিয়ে।

মার্ক জাকারবার্গ : বর্তমান পৃথিবীর সবচেয়ে জনপ্রিয় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের নাম ফেসবুক। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী মার্ক জাকারবার্গ ও তার চার বন্ধুর হাতে সূচিত হয় ফেসবুক। শুরুতে এটি কেবল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে আবদ্ধ থাকলেও ২০১৫ সালের মার্চ মাসের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, বিশ্বের প্রায় ১৪১৫ মিলিয়ন মানুষ ফেসবুক ব্যবহার করেন। এ সংখ্যা প্রতিদিনই বাড়ছে।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (ICT) এর প্রযুক্তিগত ভিত্তি

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (ICT) এর প্রযুক্তিগত ভিত্তি গঠিত হয় বিভিন্ন উপাদানের মাধ্যমে, যা একসাথে কাজ করে তথ্য সংগ্রহ, প্রক্রিয়াকরণ, সংরক্ষণ এবং যোগাযোগের জন্য ব্যবহৃত হয়। ICT এর প্রযুক্তিগত ভিত্তি নিম্নোক্ত উপাদানগুলির উপর নির্ভরশীল:

১. হার্ডওয়্যার (Hardware)

হার্ডওয়্যার হল শারীরিক উপাদানগুলি যা তথ্য প্রক্রিয়াকরণের জন্য ব্যবহৃত হয়।

কম্পিউটার সিস্টেম: ডেস্কটপ, ল্যাপটপ, সার্ভার ইত্যাদি।

ইনপুট ডিভাইস: কীবোর্ড, মাউস, স্ক্যানার, মাইক্রোফোন।

আউটপুট ডিভাইস: মনিটর, প্রিন্টার, স্পিকার।

স্টোরেজ ডিভাইস: হার্ড ড্রাইভ, SSD, USB ড্রাইভ, ক্লাউড স্টোরেজ।

নেটওয়ার্কিং হার্ডওয়্যার: রাউটার, সুইচ, মডেম, NIC (Network Interface Card)।

২. সফটওয়্যার (Software)

সফটওয়্যার হল প্রোগ্রাম ও অপারেটিং সিস্টেম যা হার্ডওয়্যারকে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করে। সফটওয়্যার প্রধানত দুই প্রকার-

1. **অপারেটিং সিস্টেম (OS):** উইন্ডোজ, ম্যাকওএস, লিনাক্স।
2. **অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার:** ওয়ার্ড প্রসেসর, স্প্রেডশীট, ডাটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম।
3. **প্রোগ্রামিং সফটওয়্যার:** নতুন সফটওয়্যার তৈরির জন্য ব্যবহৃত হয়।

সাধারনত আমরা কম্পিউটার ব্যবহারকারীরা কোন না কোন এপ্লিকেশন সফটওয়্যার এর মাধ্যম কাজ সম্পন্ন করার জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করি। এপ্লিকেশন সফটওয়্যার এই নির্দেশনা অপারেটিং সিস্টেম এর উপযোগী করার জন্য প্রয়োজনীয় রুপান্তর করে অপারেটিং সিস্টেমকে নির্দেশনা প্রদান করে। অপারেটিং সিস্টেম এই নির্দেশনা সংশ্লিষ্ট হার্ডওয়্যারকে প্রদান করে। হার্ডওয়্যার কাজটি সম্পন্ন করে কাজের স্ট্যাটাস (কাজটি সঠিকভাবে সম্পন্ন হলো কিনা) অপারেটিং সিস্টেমকে জানায়। অপারেটিং সিস্টেম কাজের স্ট্যাটাস এপ্লিকেশন সফটওয়্যারকে জানায়। এপ্লিকেশন সফটওয়্যার কাজের স্ট্যাটাস ব্যবহারকারীরা জানায়। সাধারনত চোখের নিমেষে এই ভাবে কম্পিউটারে নির্দেশনা বাস্তবায়নের পুরো প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হয়।

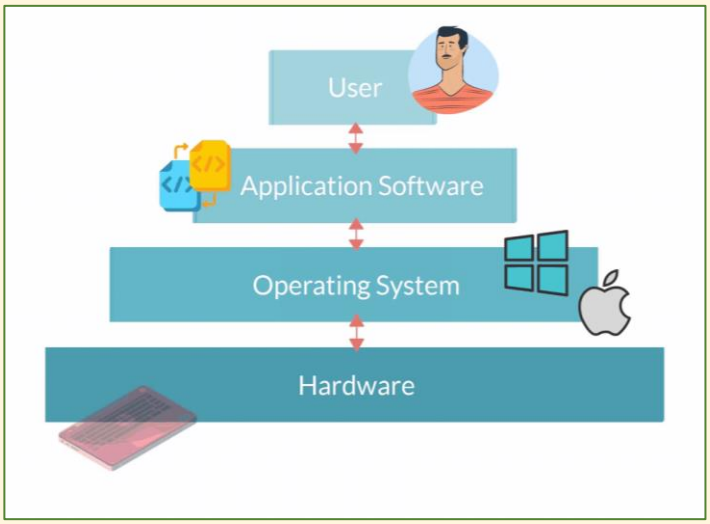

এই সমস্ত উপাদানগুলি একসাথে ICT এর প্রযুক্তিগত ভিত্তি গঠন করে এবং তথ্য প্রক্রিয়াকরণ ও যোগাযোগের জন্য আধুনিক প্রযুক্তির প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে।

৩. নেটওয়ার্কিং (Networking)

নেটওয়ার্কিং হল হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার উপাদানগুলির মাধ্যমে একাধিক ডিভাইসের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন।

- লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক (LAN): একটি ছোট এলাকায় ডিভাইসগুলি সংযুক্ত।
- ওয়াইড এরিয়া নেটওয়ার্ক (WAN): বৃহত্তর এলাকা জুড়ে ডিভাইসগুলি সংযুক্ত।
- মেট্রোপলিটন এরিয়া নেটওয়ার্ক (MAN): এটি একটি শহর বা মেট্রোপলিটন এলাকার মধ্যে বিস্তৃত নেটওয়ার্ক।
- পার্সোনাল এরিয়া নেটওয়ার্ক (PAN): এটি খুব ছোট এলাকার মধ্যে ব্যক্তিগত ডিভাইস সংযোগ করে, যেমন একটি স্মার্টফোন এবং ল্যাপটপের মধ্যে ব্লুটুথ সংযোগ।
- ইন্টারনেট: একটি বিশ্বব্যাপী নেটওয়ার্ক যা তথ্য এবং পরিষেবা সরবরাহ করে।
- ইন্ট্রানেট: একটি প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ নেটওয়ার্ক।
- প্রোটোকলস: TCP/IP, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP ইত্যাদি।

৪. ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (DBMS)

ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম এমন সফটওয়্যার যা ডেটা সংগ্রহ, সংরক্ষণ, পরিচালনা ও পুনরুদ্ধার করতে ব্যবহৃত হয়।

- রিলেশনাল ডেটাবেস: MySQL, PostgreSQL, Oracle Database।
- নন-রিলেশনাল ডেটাবেস: MongoDB, Cassandra, Redis।
- SQL: ডেটাবেসের সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করার জন্য ব্যবহৃত স্ট্যান্ডার্ড ভাষা।

৫. ক্লাউড কম্পিউটিং (Cloud Computing)

ক্লাউড কম্পিউটিং হল ইন্টারনেটের মাধ্যমে ডেটা এবং প্রোগ্রামগুলি সংরক্ষণ ও অ্যাক্সেস করার একটি পদ্ধতি।

- সার্ভিস মডেলস: IaaS (Infrastructure as a Service), PaaS (Platform as a Service), SaaS (Software as a Service)।

- প্রদানকারীরা: Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, Google Cloud Platform (GCP)।

৬. সিকিউরিটি (Security)

ICT সিকিউরিটি হল তথ্য এবং নেটওয়ার্ককে সুরক্ষিত করার জন্য ব্যবহৃত প্রযুক্তি ও পদ্ধতি।

- অ্যান্টিভাইরাস সফটওয়্যার: ডিভাইসকে ম্যালওয়্যার থেকে রক্ষা করা।
- ফায়ারওয়াল: নেটওয়ার্ক ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ এবং অবাঞ্ছিত অ্যাক্সেস প্রতিরোধ করা।
- এনক্রিপশন: ডেটা সুরক্ষিত করতে এনক্রিপশন ব্যবহার করা।
- অথেনটিকেশন সিস্টেম: পাসওয়ার্ড, বায়োমেট্রিক্স, দুই-ফ্যাক্টর অথেনটিকেশন।

৭. ইন্টারনেট অফ থিংস (IoT)

IoT হল ইন্টারনেটের সাথে সংযুক্ত শারীরিক ডিভাইস ও সেন্সরের একটি নেটওয়ার্ক যা ডেটা সংগ্রহ ও শেয়ার করে।

- সেন্সর ও অ্যাকচুয়েটর: বিভিন্ন প্রকারের সেন্সর যা পরিবেশের ডেটা সংগ্রহ করে এবং অ্যাকচুয়েটর যা সেই ডেটার ভিত্তিতে পদক্ষেপ নেয়।
- কানেক্টিভিটি: Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee, LoRaWAN ইত্যাদি।

৮. ডেটা অ্যানালিটিক্স এবং বিগ ডেটা (Data Analytics and Big Data)

বড় পরিমাণ ডেটা সংগ্রহ, বিশ্লেষণ এবং মূল্যায়ন করার প্রযুক্তি ও পদ্ধতি।

- ডেটা প্রসেসিং টুলস: Hadoop, Spark।
- অ্যানালিটিক্স প্ল্যাটফর্মস: Tableau, Power BI।
- মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম: ডেটা থেকে অন্তর্দৃষ্টি ও পূর্বাভাস তৈরি করতে ব্যবহৃত।

৯. আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (AI) এবং মেশিন লার্নিং (ML)

AI ও ML প্রযুক্তি হল এমন সিস্টেম যা ডেটা থেকে শেখে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে।

- অ্যালগরিদম: লিনিয়ার রিগ্রেশন, ডিপ লার্নিং, রিইনফোর্সমেন্ট লার্নিং।
- ফ্রেমওয়ার্কস: TensorFlow, PyTorch, Scikit-learn।

এই সমস্ত উপাদানগুলি একসাথে ICT এর প্রযুক্তিগত ভিত্তি গঠন করে এবং তথ্য প্রক্রিয়াকরণ ও যোগাযোগের জন্য আধুনিক প্রযুক্তির প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে।

এনালগ কম্পিউটার ও ডিজিটাল কম্পিউটারের বর্ণনা

অ্যানালগ কম্পিউটার (Analog Computer) : অ্যানালগ কম্পিউটার ক্রমাগত পরিবর্তনশীল সংকেত বা অ্যানালগ সংকেত ব্যবহার করে। এটি সরবরাহকৃত উপাত্তগুলোকে বৈদ্যুতিক ভোল্টে রূপান্তর করে। এই কম্পিউটার একটি পরিমাপক ব্যবস্থা। এর আউটপুট সাধারণত কাটার মাধ্যমে দেখানো হয়। বাহ্যিক অবস্থার ওপর অনেক অংশই নির্ভরশীল। সাধারণত কেমিক্যাল ল্যাবরেটরির মান নিয়ন্ত্রণে এবং পেট্রোল পাম্পের তেলপ্রবাহের পরিমাণ নির্ণয়ে, বাতাসের চাপ, তাপ, বায়ুপ্রবাহ, বিদ্যুৎ তরঙ্গ, শব্দ তরঙ্গ ইত্যাদি নির্ণয়ের ক্ষেত্রে এই কম্পিউটার ব্যবহৃত হয়। এর খরচও কম।

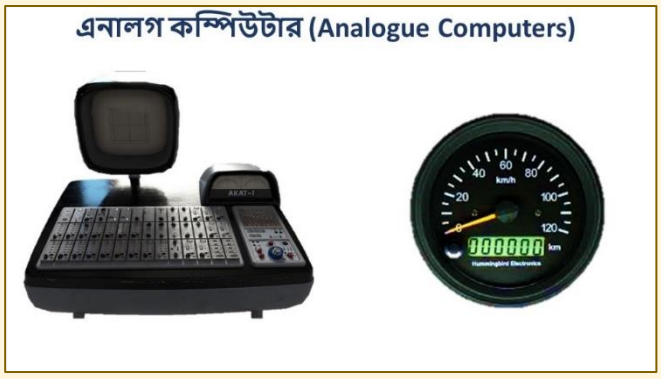

উদাহরণ : গাড়ির স্পিড মিটার, হার্টের বিট মাপার যন্ত্র ইত্যাদি।

ডিজিটাল কম্পিউটার (Digital Computer) : ডিজিটাল কম্পিউটারের স্মৃতিশক্তির ওপর নির্ভর করে। দশমিকের পর অনেক ঘর পর্যন্ত কাজ করতে পারে। এর সাহায্যে যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ ছাড়াও ডেটা সংগ্রহ, জন্ম মৃত্যু হারের গ্রাফ, সারি ও কলাম তৈরি, নকশা প্রণয়ন ইত্যাদি কাজ করা যায়। এই কম্পিউটারের বৈদ্যুতিক সংকেত ০ ও ১ ব্যবহার করে বুলিয়ান অ্যালজেবরার ভিত্তিতে কাজ করে। সংখ্যা, বর্ণ বা চিহ্নকে সরাসরি বৈদ্যুতিক ছন্দে রূপান্তর করে। এটি মূলত একটি সংখ্যাগত ব্যবস্থা। ডিজিটাল কম্পিউটারের আউটপুট স্ক্রিনে দেখানো হয়। এর খরচ বেশি।

উদাহরণ : পারসোনাল কম্পিউটার, মিনি কম্পিউটার, মাইক্রো কম্পিউটার ইত্যাদি।

ইন্টারনেট

ইন্টারনেট হল একটি বিশ্বব্যাপী নেটওয়ার্ক সিস্টেম যা TCP/IP প্রোটোকলের মাধ্যমে বিভিন্ন কম্পিউটার এবং ডিভাইসকে সংযুক্ত করে। এটি বিভিন্ন নেটওয়ার্কের সমন্বয়ে গঠিত এবং এটি তথ্য বিনিময়ের একটি মাধ্যম হিসাবে কাজ করে।

ইন্টারনেটের উপাদান

ইন্টারনেটের প্রধান উপাদানগুলো হল:

1. **ওয়েব সার্ভার:** ওয়েব সার্ভারগুলি ওয়েব পেজগুলি হোস্ট করে এবং ব্যবহারকারীদের ব্রাউজারের অনুরোধে ওয়েব পেজগুলি সরবরাহ করে।
2. **ডোমেইন নাম সিস্টেম (DNS):** DNS ডোমেইন নামকে আইপি ঠিকানায় রূপান্তর করে, যা কম্পিউটারগুলি বুঝতে পারে।
3. **ইন্টারনেট প্রোটোকল (IP):** IP ঠিকানাগুলি ডিভাইসগুলির মধ্যে যোগাযোগ নিশ্চিত করে।
4. **ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার (ISP):** ISP ইন্টারনেট সংযোগ সরবরাহ করে।

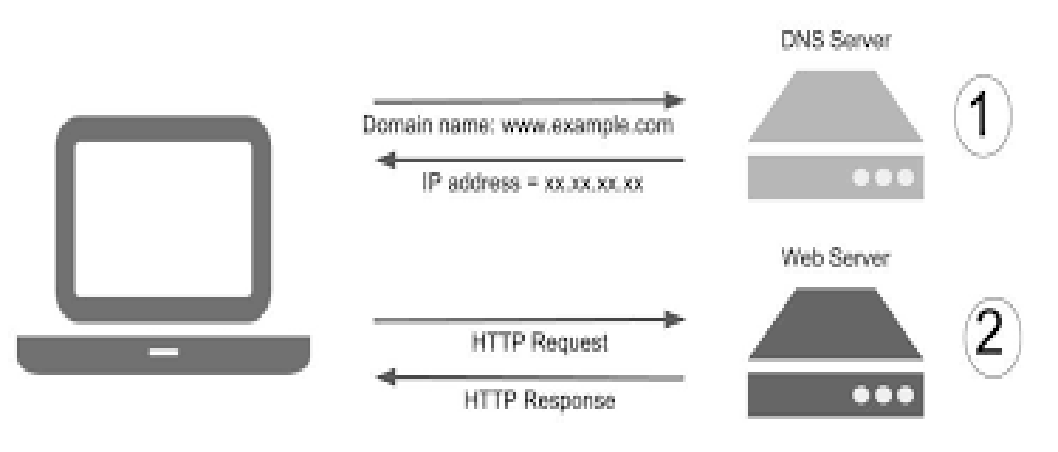

ইন্টারনেট ব্যবহারের প্রাথমিক ধারণা

ইন্টারনেট ব্যবহারের প্রাথমিক ধারণা সম্পর্কে জানার জন্য নিচের বিষয়গুলো গুরুত্বপূর্ণ:

১. ইন্টারনেট কী?

ইন্টারনেট হলো একটি বিশ্বব্যাপী নেটওয়ার্ক যা কম্পিউটার এবং বিভিন্ন ডিভাইসকে একে অপরের সাথে সংযুক্ত করে। এটি তথ্য বিনিময় এবং যোগাযোগের জন্য ব্যবহৃত হয়।

২. ইন্টারনেট সংযোগ

ইন্টারনেট ব্যবহার করতে আপনার একটি ইন্টারনেট কানেকশন প্রয়োজন। এটি মোবাইল ডেটা, ওয়াইফাই, ব্রডব্যান্ড বা অন্য কোনো মাধ্যম হতে পারে।

৩. ইন্টারনেট ব্যবহারের প্রয়োজনীয় ডিভাইস

ইন্টারনেট ব্যবহারের জন্য কয়েকটি প্রধান ডিভাইস প্রয়োজন। এগুলি হল:

1. **কম্পিউটার বা ল্যাপটপ:** ইন্টারনেট ব্রাউজিং, ই-মেইল চেক করা, সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার, অনলাইন শপিং, গবেষণা ইত্যাদির জন্য।
2. **স্মার্টফোন:** মোবাইল ডিভাইসের মাধ্যমে ইন্টারনেট ব্রাউজিং, অ্যাপ ব্যবহার, ইমেইল, ভিডিও কল, সোশ্যাল মিডিয়া, এবং অনেক কিছু করা যায়।
3. **ট্যাবলেট:** কম্পিউটার বা স্মার্টফোনের চেয়ে একটু বড় স্ক্রীন, যা ইন্টারনেট ব্যবহারের জন্য উপযোগী।
4. **রাউটার:** ইন্টারনেট সংযোগের জন্য ওয়াই-ফাই সিগন্যাল প্রদান করে, যার মাধ্যমে একাধিক ডিভাইস একসাথে ইন্টারনেট ব্যবহার করতে পারে।
5. **মডেম:** ইন্টারনেট সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান থেকে ইন্টারনেট সংযোগ সংগ্রহের জন্য ব্যবহৃত হয়।
6. **ইন্টারনেট কেবল:** ওয়াইফাই ব্যবহার না করে সরাসরি ইন্টারনেট সংযোগ স্থাপন করার জন্য।

এছাড়া, কিছু বিশেষ ডিভাইসও ব্যবহার করা হয় যেমন স্মার্ট টিভি, গেমিং কনসোল, বা ইন্টারনেট-সংযুক্ত যন্ত্রপাতি।

৪. ব্রাউজার কী?

ইন্টারনেট ব্যবহারের জন্য ব্রাউজার প্রয়োজন হয়। এটি একটি সফটওয়্যার যার মাধ্যমে আপনি বিভিন্ন ওয়েবসাইট ভিজিট করতে পারবেন। জনপ্রিয় ব্রাউজারগুলোর মধ্যে রয়েছে:

- Google Chrome
- Mozilla Firefox
- Microsoft Edge

৫. সার্চ ইঞ্জিন কী?

ইন্টারনেটে তথ্য খুঁজে বের করার জন্য সার্চ ইঞ্জিন ব্যবহৃত হয়। উদাহরণ:

- Google
- Bing
- Yahoo

ই-লার্নিং ও বাংলাদেশ

পৃথিবীতে জ্ঞান অর্জনের একটা সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি দীর্ঘদিন থেকে মোটামুটি একইভাবে কাজ করে আসছিল। তথ্যপ্রযুক্তির উন্নতি হওয়ার পর প্রথমবার সেই পদ্ধতির এক ধরনের পরিবর্তন হতে শুরু করেছে এবং ই-লার্নিং নামে নতুন কিছু শব্দের সাথে আমরা পরিচিত হতে শুরু করেছি। ই-লার্নিং শব্দটি ইলেকট্রনিক লার্নিং কথাটির সংক্ষিপ্ত রূপ এবং এটা বলতে আমরা পাঠদান করার জন্যে সিডি রম, ইন্টারনেট, ব্যক্তিগত নেটওয়ার্ক কিংবা টেলিভিশন চ্যানেল ব্যবহার করার পদ্ধতিকে বুঝিয়ে থাকি। মনে রাখতে হবে ই-লার্নিং কিন্তু মোটেও সনাতন পদ্ধতিতে পাঠদানের বিকল্প নয়, এটি সনাতন পদ্ধতির পরিপূরক। উদাহরণ দেওয়ার জন্যে বলা যায়, শ্রেণিকক্ষে বিজ্ঞানের একটা বিষয় পড়ানোর সময় অনেক কিছুই হয়তো হাতে-কলমে দেখানো সম্ভব নয়। যেমন- সূর্যগ্রহণ, চন্দ্রগ্রহণ ইত্যাদি। শ্রেণিকক্ষে পাঠ দিতে দিতে শিক্ষক ইচ্ছে করলেই মাল্টিমিডিয়ার সাহায্য নিয়ে আরও সুন্দরভাবে বিষয়টির দৃশ্যমান উপস্থাপন করতে পারেন। সেটি এমনকি ওহঃবৎধপঃরাব-ও হতে পারে ।

আমরা সবাই জানি বাংলাদেশের জনগোষ্ঠী বিশাল। সে কারণে স্কুলের শিক্ষার্থী সংখ্যাও বিশাল। নানা ধরনের অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতা থাকার কারণে আমাদের স্কুলগুলোতে দক্ষ শিক্ষকের অভাব রয়েছে। লেখাপড়ার জন্যে প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণ বলতে গেলে নেই। ল্যাবরেটরি অপ্রতুল, ফলে হাতে-কলমে বিজ্ঞানের এক্সপেরিমেন্ট করার সুযোগ খুব কম। এই সমস্যাগুলো সমাধানের জন্যে ই-লার্নিং অনেক বড় একটা ভ, মিকা রাখতে পারে। দক্ষ

একজন শিক্ষকের পাঠদান ভিডিও করে নিয়ে সেটি অসংখ্য স্কুলে বিতরণ করা যেতে পারে। একটি নির্দিষ্ট বিষয়কে বোঝানোর জন্যে অনেক ধরনের সহায়ক প্রক্রিয়া ছাত্রছাত্রীদের দেয়া যেতে পারে। একজন শিক্ষক চাইলে নিজেই তার পাঠদানে সহায়তা করার জন্যে প্রয়োজনীয় বিষয় তৈরি করতে পারেন এবং সেটি বারবার ব্যবহার করতে পারেন। বাংলাদেশের অনেক শিক্ষকই এটি ব্যবহার করছেন।

সারা পৃথিবীতেই ই-লার্নিংয়ের জন্যে নানা উপকরণ তৈরি হতে শুরু করেছে। পৃথিবীর বড় বড় অনেক বিশ্ববিদ্যালয় অসংখ্য কোর্স অনলাইনে উন্মুক্ত করে দিয়েছে এবং যে কেউ সেই কোর্সটি গ্রহণ করতে পারে। বিষয়টি নিয়ে নানা ধরনের পরীক্ষা নিরীক্ষা হচ্ছে এবং অনেক সময়েই একজন সেই কোর্সটি নেয়ার পর তার হোমওয়ার্ক জমা দিয়ে কিংবা অনলাইনে পরীক্ষা দিয়ে সেই কোর্সটির প্রয়োজনীয় ক্রেডিট পর্যন্ত অর্জন করতে পারছে।

আমাদের বাংলাদেশও এতে পিছিয়ে নেই। বাংলাদেশের তথ্যপ্রযুক্তিবিদরা এ ধরণের বেশ কিছু ওয়েব পোর্টাল তৈরি করেছেন এবং সারা পৃথিবী থেকে যে কেউ বাংলা ভাষায় সেই কোর্সগুলো গ্রহণ করতে পারে। বিশেষ করে কম্পিউটার প্রোগ্রামিংয়ে প্রশিক্ষণ নেয়ার উপযোগী এই ধরনের সাইটগুলো দেশে-বিদেশে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে।

আমাদের দেশে উত্তম পাঠদানের সীমাবদ্ধতা দূর করার ব্যাপারে ই-লার্নিং অনেক বড় ভ, মিকা রাখতে পারলেও আমাদের সব সময় মনে রাখতে হবে, এটি কিন্তু কোনোভাবেই প্রচলিত পাঠদানের বিকল্প নয়। প্রচলিত পাঠদানের সময় একজন শিক্ষক তার শিক্ষার্থীদের সরাসরি দেখতে পারেন, তাদের সাথে কথা বলতে পারেন, শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের সাথে নানাভাবে ভাব বিনিময় করতে পারে, প্রশ্ন করতে পারে। শুধু তাই নয়, তারা পাশাপাশি একে অন্যকে সাহায্য করতে পারে, একে অন্যের সহযোগী হয়ে শিখতে পারে। ই-লার্নিংয়ের বেলায় এই বিষয়গুলো প্রায় সময়ই অনুপস্থিত থাকে, পুরো প্রক্রিয়ায় মানবিক অংশটুকু না থাকায় পদ্ধতিটা যান্ত্রিক বলে মনে হতে পারে। সে কারণে

ই-লার্নিংকে সফল করতে হলে শিক্ষার্থীদের অনেক বেশি উদ্যোগী হতে হয়। আমাদের বাংলাদেশে ই-লার্নিংয়ের অনেক বড় সুযোগ আছে, কারণ অনেক বড় বড় সীমাবদ্ধতা আসলে ই- লার্নিং ব্যবহার করে সমাধান করে ফেলা সম্ভব। তবে প্রচলিত ই-লার্নিংয়ের জন্যে ইন্টারনেটের স্পিড, প্রয়োজনীয় অবকাঠামো এবং ই-লার্নিংয়ের শিখনসামগ্রী (গধঃবৎরধষং) তৈরি করার প্রয়োজন রয়েছে। বর্তমান সরকার গুরুত্বের সাথে এ ধরণের শিখনসামগ্রী তৈরি করছে। এতে আমাদের শিক্ষার্থীরা বিশ্বমানের শিক্ষা অর্জনে সক্ষম হবে।

ই-গভর্ন্যান্স ও বাংলাদেশ

গুড গভর্ন্যান্স বা সুশাসনের জন্য দরকার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিমূলক ব্যবস্থা। ডিজিটাল ব্যবস্থা প্রচলনের ফলে সরকারি ব্যবস্থাসমূহকে আধুনিক করার পাশাপাশি সরকারি ব্যবস্থাসমূহের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা সম্ভব। এর ফলে নাগরিকের হয়রানি ও বিড়ম্বনার অবসান ঘটে এবং দেশে সুশাসনের পথ নিষ্কণ্টক হয়। শাসন ব্যবস্থায় ও প্রক্রিয়ায় ইলেকট্রনিক বা ডিজিটাল পদ্ধতির প্রয়াগেই হচ্ছে ই-গভর্ন্যান্স।

একটা সময় ছিল যখন পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল সংগ্রহ করা ছিল পরীক্ষার্থী এবং তাদের অভিভাবকদের জন্য এক বিড়ম্বনার ব্যাপার। বিশেষ করে প্রধান প্রধান শহর থেকে দূরবর্তী গ্রামে অবস্থানরতদের পক্ষে এটি ছিল দুষ্কর। মাত্র দুই-দশক আগেও এসএসসি বা এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের সাত দিন পরেও অনেকেই তাদের ফলাফল জানতে পারত না। কিন্তু বর্তমানে ফল প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে ইন্টারনেট এবং মোবাইল ফোনে এসএমএসের মাধ্যমে ফলাফল জানা যায়। ফলে, ফলাফল জানার যে বিড়ম্বনা ছিল সেটির অবসান হয়েছে।

শিক্ষা ক্ষেত্রে ই-গভর্ন্যান্সের আর একটি উদাহরণ হলো উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির জন্য মোবাইল ফোনে আবেদন করার সুবিধা। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, পূর্বে যশোর জেলায় একজন শিক্ষার্থী সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে ইচ্ছুক হলে তাকে অনেকগুলো কাজ সম্পন্ন করতে হতো। এজন্য নিজে অথবা প্রতিনিধিকে সিলেট গিয়ে একবার ভর্তির আবেদনপত্র সংগ্রহ এবং পরে আবার আবেদনপত্র জমা দিতে হতো। বর্তমানে মোবাইল ফোনেই এই আবেদন করা যায়। ফলে, ভর্তিচ্ছুদের ভর্তির আবেদন ফরম জোগাড় ও জমা দেওয়ায় জন্য শহর থেকে শহরে ঘুরতে হয় না।

আবার জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সকল সেবা স্বল্প সময়ে, কম খরচে এবং ঝামেলাহীনভাবে পাওয়ার জন্য চালু হয়েছে জেলা ই-সেবা কেন্দ্র। এর ফলে আগে যেখানে কোনো সেবা পেতে ২/৩ সপ্তাহ লাগতো, সেটি এখন মাত্র ২-৫ দিনে পাওয়া যাচ্ছে। শুধু তাই নয়, তথ্যের ডিজিটালকরণের ফলে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সময় কম লাগছে। সেবা প্রদানে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধির পাশাপাশি বিভিন্ন দলিল, পর্চা প্রভৃতির নকল প্রদানে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সক্ষমতাও অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। নাগরিক যন্ত্রণার আর একটি উদাহরণ হলো পরিসেবাসমূহের বিল পরিশোধ। বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানি ইত্যাদির বিল পরিশোধের গতানুগতিক পদ্ধতি খুবই সময়সাপেক্ষ এবং যন্ত্রণাদায়ক, কোনো কোনো ক্ষেত্রে একটি সম্পূর্ণ কর্মময় দিন বিদ্যুৎ বিল পরিশোধেই নাগরিককে ব্যয় করতে হয়। কিন্তু বর্তমানে মোবাইল ফোন কিংবা অনলাইনে এই বিল পরিশোধ ও করা যায়। কেবল বিদ্যুৎ নয়, পানি ও গ্যাসের বিলও এখন অনলাইনে ও মোবাইল ফোনে পরিশোধ করা যায়। গভর্ন্যান্সের মূল বিষয় হলো নাগরিকের জীবনমান উন্নত করা এবং হয়রানিমুক্ত রাখা। ই-গভর্ন্যান্সের মাধ্যমে কোনো কোনো কার্যক্রম ৩৬৫ দিনের ২৪ ঘন্টা করা সম্ভব যেমন- অঞগ সেবা, গড়নরষব ব্যাংকিং তথ্য সেবা ইত্যাদি। ফলে, নাগরিকরা নিজেদের সুবিধাজনক সময়ে সেবা গ্রহণ করতে পারে।

অন্যদিকে ই-গভর্ন্যান্স চালুর ফলে সরকারি দপ্তরসমূহের মধ্যে আন্তঃসংযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে, কর্মীদের দক্ষতাও বেড়েছে। ফলে দ্রুত সেবা প্রদান সম্ভব হচ্ছে।

বাংলাদেশে ই- গভর্ন্যান্স চালু হয়েছে বেশ কয়েক বছর হয়েছে। এখনো কিছু ক্ষেত্রে ই-গভর্ন্যান্স চালু হওয়া বাকি রয়েছে। সকল ক্ষেত্রে ই-গভর্ন্যান্স চালু হলে সুশাসনের পথে দেশ অনেক এগিয়ে যাবে।

ই-কমার্স ও বাংলাদেশ

একটি দেশের বিকাশ ও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে বাণিজ্যের কোনো বিকল্প নেই। ডিজিটাল প্রযুক্তির বিকাশ, ইন্টারনেটের উদ্ভব ও বিকাশ এবং কাগজের মুদ্রার বাইরেও ইলেকট্রনিক বিনিময় প্রথা চালু হওয়ার ফলে বাণিজ্যেরও একটি বিশেষ পরিবর্তন হয়েছে। এখন ইলেকট্রনিক মাধ্যমেও বাণিজ্য করা যায়, যার প্রচলিত নাম ই-কমার্স বা ই-বাণিজ্য।

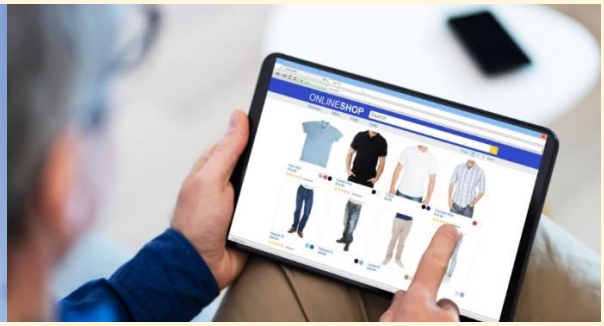

যেকোনো পণ্য বা সেবা বাণিজ্যের কয়েকটি শর্ত থাকে। প্রথমত বিক্রেতার কাছে পণ্য থাকা। দ্বিতীয়ত ক্রেতা কর্তৃক তার বিনিময় মূল্য পরিশোধ করা। এর প্রধান পদ্ধতি হলো বিক্রেতার সঙ্গে ক্রেতার সরাসরি যোগাযোগ। কিন্তু ইন্টারনেটের যুগে একজন বিক্রেতা তার পণ্যের ছবি, ভিডিও দিয়ে ইন্টারনেটেই তার 'দোকান' টি খুলে বসতে পারেন। এজন্য তার প্রতিষ্ঠানের একটি ওয়েবসাইট চালু করতে হয়। ক্রেতা অনলাইনে তার পছন্দের পণ্যটি পছন্দ করেন এবং মূল্য পরিশোধ করেন। দেশে বর্তমানে বিভিন্ন ডেবিট বা ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে এই মূল্য পরিশোধের সুযাে্গ রয়েছে। এছাড়া মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমেও মূল্য পরিশোধ করা যায়। তৃতীয়ত মূল্য প্রাপ্তির পর বিক্রেতা তার পণ্যটি ক্রেতার ঠিকানায় নিজে অথবা পণ্য সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের (কুরিয়ার সার্ভিস) মাধ্যমে পাঠিয়ে দেন।

মোবাইল বা কার্ড ছাড়াও ই-কমার্সে আরাে একটি বিল পরিশোধ পদ্ধতি রয়েছে। এটিকে বলা হয় প্রাপ্তির পর পরিশোধ বা ক্যাশ অন ডেলিভারি (ঈঙউ)। এই পদ্ধতিতে ক্রেতা বিক্রেতার ওয়েবসাইটে বসে পছন্দের পণ্যটির অর্ডার দেন। বিক্রেতা তখন পণ্যটি ক্রেতার কাছে পাঠিয়ে দেন। ক্রেতা পণ্য পেয়ে বিল পরিশোধ করেন।

২০১১-১২ সাল থেকে বাংলাদেশেও আস্তে আস্তে ই-কমার্সের প্রসার হচ্ছে। বর্তমানে বই থেকে শুরু করে জামা, কাপড়, খাবার, শৌখিনসামগ্রী ইত্যাদি ই-কমার্সের মাধ্যমে বেচাকেনা হচ্ছে। প্রচলিত বাণিজ্যের মতো ই-কমার্সেও দুই ধরনের প্রতিষ্ঠান লক্ষ করা যায়। এক ধরনের প্রতিষ্ঠান কেবল নিজেদের পণ্য বিক্রয় করে থাকে। আবার কিছু কিছু প্রতিষ্ঠান অন্য অনেক প্রতিষ্ঠানের পণ্য বিক্রয় করে। তোমরা ইতোমধ্যে ওয়েবসাইট, টিভি বা পত্র-পত্রিকায় এধরনের অনেক ওয়েবসাইটের বিজ্ঞাপন দেখে ফেলেছ।

সামাজিক যোগাযোগ ও আইসিটি

মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। সমাজে চলাফেরা ও বিকাশের জন্য মানুষে মানুষে যোগাযোগের প্রয়োজন। তবে এখন আইসিটিতে সামাজিক যোগাযোগ বলতে নেটওয়ার্কের মাধ্যমে মানুষে মানুষে মিথস্ক্রিয়াকেই বোঝায় । এর অর্থ হলো তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে মানুষ যোগাযোগ ও ভাব প্রকাশের জন্য যা কিছু সৃষ্টি, বিনিময় কিংবা আদান-প্রদান করে তাই সামাজিক যোগাযোগ। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির বিকাশের ফলে বর্তমানে এই যোগাযোগ হয়ে পড়েছে সহজ, সাশ্রয়ী এবং অনেক ক্ষেত্রে নিরাপদ। ইন্টারনেটের ব্যবহার, ই- মেইল, মোবাইল ফোন ও মেসেজিং সিস্টেম, বøগিং এবং সামাজিক যোগাযোগ প্ল্যাটফর্মসমূহ ব্যবহার করে বর্তমানে আইসিটিভিত্তিক সামাজিক যোগাযোগ অনেকাংশে সহজ।

ইন্টারনেটে গড়ে উঠেছে অনেক প্ল্যাটফর্ম, যা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম হিসেবে পরিচিত। যেমন: ফেসবুক, টুইটার, লিঙ্কডইন ও ইনস্টাগ্রাম। এর মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় দুইটি মাধ্যম হলো-ফেসবুক ও টুইটার ।

ফেসবুক (www.facebook.com)

ফেসবুক সামাজিক যোগাযোগ ব্যবস্থার একটি ওয়েবসাইট। ২০০৪ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারি মার্ক জুকারবার্গ তার অন্য বন্ধুদের সঙ্গে নিয়ে এটি চালু করেন। বিনামূল্যে যে কেউ ফেসবুকের সদস্য হতে পারে। ব্যবহারকারীগণ বন্ধু সংযোজন, বার্তা প্রেরণ এবং তাদের ব্যক্তিগত তথ্যাবলি প্রকাশ, আদান-প্রদান ও হালনাগাদ করতে পারেন। এছাড়া এতে অডিও ও ভিডিও প্রকাশ করা যায়। ফেসবুকে যেকোনো প্রতিষ্ঠান তাদের নিজস্ব পেজ যেমন খুলতে পারে, তেমনি সমমনা বন্ধুরা মিলে চালু করতে পারে কোনো গ্রæপ। www.stastica.com এর রিপোর্ট (জানুয়ারী ২০২৪) অনুযায়ী বিশ্বে সক্রিয় ফেসবুক ব্যবহারকারীর সংখ্যা ৩ বিলিয়ন।

টুইটার (www.twitter.com)

টুইটারও একটি সামাজিক যোগাযোগ ব্যবস্থা। তবে ফেসবুকের সঙ্গে এর একটি মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। এটিতে ব্যবহারকারীদের সর্বোচ্চ ১৪০ Character -এর মধ্যে তাদের মনোভাব প্রকাশ ও আদান-প্রদান করতে হয়। এজন্য এটিকে মাইক্রোব্লগিংয়ের একটি ওয়েবসাইটও বলা যায়। ১৪০ অক্ষরের এই বার্তাকে বলা হয় টুইট (twit)। টুইটারের সদস্যদের টুইট বার্তাগুলো তাদের প্রোফাইল পাতায় দেখা যায়। টুইটারের সদস্যরা অন্য সদস্যদের টুইট পড়ার জন্য সে সদস্যকে অনুসরণ বা follow করতে পারেন। কোনো সদস্যকে যারা অনুসরণ করে তাদেরকে বলা হয় follower বা অনুসারী।

বিনোদন ও আইসিটি

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উন্নয়নের সাথে বিনোদনের জগতে একটা নতুন দিক উম্মোচিত হয়েছে। এটি ঘটেছে দুইভাবে। প্রথমত, বিনোদনটি কীভাবে মানুষ গ্রহণ করবে সেই প্রক্রিয়াটিতে একটা মৌলিক পরিবর্তন হয়েছে। দ্বিতীয়ত, বিনোদনের ভিন্ন ভিন্ন মাধ্যমগুলোতে একটা গুণগত পরিবর্তন হয়েছে।

দেখা যাক বিনোদন গ্রহণের প্রক্রিয়ায় পরিবর্তনটি কীভাবে ঘটেছে। একটা সময় ছিল যখন বিনোদনের জন্য মানুষকে ঘরের বাইরে যেতে হতো। সিনেমা দেখতে হলে সিনেমা হলে যেতে হতো, খেলা দেখতে হলে খেলার মাঠে যেতে হতো, গান শুনতে হলে গানের জলসায় যেতে হতো। এখন এধরনের বিনোদনের জন্যে মানুষের আর ঘর থেকে বের হতে হয় না। প্রথমে রেডিও, তারপর টেলিভিশন এসেছে। তারপর এসেছে কম্পিউটার। একসময় কম্পিউটার সংযুক্ত হয়েছে ইন্টারনেটের সাথে। আমরা আবিষ্কার করেছি একজন মানুষ চার দেওয়ালের ভেতরে আবদ্ধ থেকেই পৃথিবীর প্রায় সব ধরনের বিনোদন উপভাগ করতে পারে। প্রথম যখন কম্পিউটার আবিষ্কার হয়েছিল তখন তার মূল কাজ ছিল কমপিউট বা হিসাব করা, শুধু বড় বড় প্রতিষ্ঠান বা সরকার একটা কম্পিউটারের মালিক হতে পারত। প্রযুক্তির উন্নতির সাথে সাথে কম্পিউটার সহজলভ্য হয়ে এসেছে এবং একসময় মানুষ তার নিজের ব্যক্তিগত কাজের জন্যে কম্পিউটার ব্যবহার করতে শুরু করেছে। কম্পিউটার যখন শক্তিশালী হয়েছে তখন এটি শুধু লেখালেখি বা হিসাব-নিকাশের জন্যে ব্যবহৃত না হয়ে ধীরে ধীরে বিনোদনের জন্যে ব্যবহৃত হতে শুরু করেছে। এখন সাধারণ মানুষ কম্পিউটারকে সম্ভবত সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করে বিনোদনের জন্যে। গান, চলচ্চিত্র, আলোকচিত্র সবকিছুই এখন কম্পিউটার দিয়ে করা যায়। তথ্যপ্রযুক্তির কারণে বিনোদন গ্রহণের প্রক্রিয়াটিতে যেরকম পরিবর্তন এসেছে ঠিক সেরকম

পরিবর্তন এসেছে বিনোদনের বিষয়গুলোতে। সঙ্গীতকে ডিজিটাল রূপ দেওয়ায় এখন আমরা কম্পিউটারে গান শুনতে পারি। ঠিক একইভাবে আমরা ভিডিও বা চলচ্চিত্র দেখতে পারি। সিডি রম কিংবা ডিভিডি বের হওয়ার পর সেখানে বিশাল পরিমাণের তথ্য রাখা সম্ভবপর হয়েছে। সিনেমা হলে না গিয়ে ঘরে বসে কম্পিউটার কিংবা টেলিভিশনে ডিভিডি থেকে চলচ্চিত্র দেখা এখন খুবই সাধারণ একটা বিষয়। ফাইবার অপটিক নেটওয়ার্ক বসানোর পর দ্রুতগতির ইন্টারনেট সহজলভ্য হতে শুরু করেছে। কাজেই এখন একজনকে আর গান শোনার জন্যে কিংবা চলচ্চিত্র দেখার জন্যে অডিও সিডি বা ডিভিডির উপর নির্ভর করতে হয় না। ইন্টারনেট ব্যবহার করে সরাসরি গান বা চলচ্চিত্র উপভাোগ করা সম্ভব হচ্ছে। শুধু তাই নয় রেডিও বা টেলিভিশন চ্যানেলগুলো এখন ইন্টারনেট ব্যবহার করে শোনা ও দেখা যায় এবং সেগুলো অনেক সময়েই রেকর্ড করা থাকে বলে কাউকেই আর কোনো কিছুর জন্যে নির্দিষ্ট সময় অপেক্ষা করতে হয় না, যখন যেটি দেখার ইচ্ছে করে তখনই সেটা দেখতে পারে।

তথ্যপ্রযুক্তি উন্নত হবার পর নতুন কিছু বিনোদনের জন্ম হয়েছে যেটি আগে উপভাগ করা সম্ভব ছিল না, তার একটি হচ্ছে কম্পিউটার গেম। সারা পৃথিবীতেই এখন কম্পিউটার গেমের বিশাল শিল্প তৈরি হয়েছে এবং নানা ধরনের কম্পিউটার গেমের জন্ম হয়েছে। কম্পিউটার গেমের ব্যাপক জনপ্রিয়তা দেখেই আমরা আন্দাজ করতে পারি এটি বিনোদনের অত্যন্ত সফল একটি মাধ্যম। এর সাফল্যের প্রধান একটি কারণ হচ্ছে এটি ছাোট শিশু থেকে প্রাপ্ত বয়স্ক একজন মানুষ সবাইকেই তার নিজের রুচি মাফিক আনন্দ দিতে পারে। একজন আরেক জনের সাথে কম্পিউটার গেম খেলতে পারে, কম্পিউটারের সাথে খেলতে পারে এমনকি নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে বাইরের কারাো সাথেও খেলতে পারে। সত্যি কথা বলতে কি, অনেক ক্ষেত্রেই এই বিনোদন উপভাোগের তীব্রতা এত বেশি হতে পারে যে, সেটি এক ধরনের আসক্তির জন্ম দিতে পারে এবং সে কারণে কম্পিউটার গেম উপভাোগ করার ব্যাপারে সারা পৃথিবীতেই সবাইকে সতর্ক থাকার কথা বলা হচ্ছে। তথ্যপ্রযুক্তি বিনোদন সৃষ্টির ব্যাপারেও এক ধরনের বড় ভ

, মিকা রেখেছে। অ্যানিমেশন বা কার্টুন তৈরি করা এক সময় অনেক কঠিন একটা বিষয় ছিল। তথ্যপ্রযুক্তি এবং শক্তিশালী কম্পিউটারের কারণে এখন এটি অনেক সহজ হয়ে গেছে। শুধু তাই নয় সৃষ্টিশীল মানুষের সৃজনশীলতার কারণে সম্পূর্ণ নতুন এক ধরনের ব্যাপার ঘটতে শুরু করেছে। সত্যিকারের অভিনেতা অভিনেত্রী ছাড়াই গ্রাফিক্স নির্ভর চলচ্চিত্রের ডিজিটাল অভিনেতা-অভিনেত্রীর জন্ম হতে শুরু করেছে। বিখ্যাত ব্যবসাসফল চলচ্চিত্রে কাল্পনিক প্রাণী ডাইনোসর কিংবা ভিন্ন জগতের প্রাণী তৈরি করার জন্যে শক্তিশালী কম্পিউটার ব্যবহার করা এখন অত্যন্ত সাধারণ একটি বিষয়।

এক কথায় আমরা বলতে পারি, তথ্যপ্রযুক্তির কারণে শুধু যে নতুন নতুন বিনোদনের জন্ম নিচ্ছে তা নয়, সেই বিনোদনগুলো এখন একেবারে সাধারণ মানুষের কাছেও পৌছে যাচ্ছে। সবচেয়ে বড় কথা এটি মাত্র শুরু, ভবিষ্যতে আইসিটি নির্ভর বিনোদন কোন পর্যায়ে যাবে সেটি কল্পনা করাও অসম্ভব!

ইন্টারনেট কীভাবে কাজ করে?

এমন প্রশ্নে বড়রাও ঘাবড়ে যেতে পারে, তাই না? কারণ এটি বেশ জটিল একটি বিষয়। তবে এখানে তোমাদের জন্য বিষয়টি আলোচনা করে খুব সহজে বুঝিয়ে দেওয়া হবে। তাই কপালের ভাঁজ সোজা করে বসো। এবার চলো জেনে নিই ইন্টারনেট কীভাবে কাজ করে। তুমি কখনো জাল দিয়ে মাছ ধরা দেখেছো? পুকুর বা নদীতে জাল ফেলে জেলেরা যখন মাছ ধরে, তখন দেখবে জালের সুতাগুলো পরস্পরের সাথে কেমন সুন্দরভাবে গিঁট দেওয়া থাকে। আর থাকে ছোট ছোট ছিদ্র। ওই ছিদ্র দিয়ে পানি বের হয়ে যায় আর মাছ আটকে থাকে জালের ভেতরে।

ইন্টারনেটকে তুমি এই মাছ ধরার জালের সাথে তুলনা করতে পারো। ধরো ইন্টারনেট হলো জাল আর ওই জালের ভেতর আটকে থাকা সমস্ত মাছ হলো কম্পিউটার। এটি এমন একটি অদৃশ্য জাদুর জাল, যার ভিতরে বিশ্বের সমস্ত কম্পিউটার সংযুক্ত রয়েছে।

ইন্টারনেট ঠিকভাবে কাজ করার জন্য একে গ্লোবাল নেটওয়ার্কের সাথে তার বা বেতার যে কোনো একটি মাধ্যমে সংযুক্ত থাকতে হয়। গ্লোবাল নেটওয়ার্কের সাথে যুক্ত থাকা বিভিন্ন কম্পিউটারের সাথে তোমার কম্পিউটারটি

রাউটার এবং সার্ভারের মাধ্যমে যুক্ত হয়ে যায়। এর পরই ইন্টারনেট থেকে বিভিন্ন ডাটা এবং ইন্টারনেট ঠিকভাবে কাজ করার জন্য একে গ্লোবাল নেটওয়ার্কের সাথে তার বা বেতার যে কোনো একটি মাধ্যমে সংযুক্ত থাকতে হয়।

গ্লোবাল নেটওয়ার্কের সাথে যুক্ত থাকা বিভিন্ন কম্পিউটারের সাথে তোমার কম্পিউটারটি রাউটার এবং সার্ভারের মাধ্যমে যুক্ত হয়ে যায়। এর পরই ইন্টারনেট থেকে বিভিন্ন ডাটা এবং ইনফরমেশন সংগ্রহ করতে পারো। ইন্টারনেট এভাবেই কাজ করে।

তুমি যখন কোনো ওয়েবসাইট পরিদর্শন করো, তখন তোমার কম্পিউটারটি ইন্টারনেটের মাধ্যমে একটি বিশেষ সার্ভারে তোমার করা অনুরোধটি পাঠিয়ে দেয়। সেই সার্ভারে ওয়েবসাইটগুলো সংরক্ষণ করা হয় এবং সেটি তোমার কম্পিউটারের হার্ড ড্রাইভের মতোই কাজ করে। তোমার পাঠানো অনুরোধটি পাওয়ার পর, সার্ভারটি সেই ওয়েবসাইটটি খুঁজে বের করে এবং সঠিক ডেটা তোমার কম্পিউটারে পাঠিয়ে দেয়। আর মুহূর্তের মধ্যেই তুমি তথ্যটি পেয়ে যাও। একদম জাদুর মতো তাই না?

ই-মেইল

ই-মেইল- বর্তমান যুগের ডিজিটাল চিঠি! ভাবুন, তুমি চিঠি লিখছেন। কিন্তু এই চিঠি ডাকঘরে না দিয়ে, ইন্টারনেটের মাধ্যমে মুহূর্তের মধ্যে পাঠিয়ে দিচ্ছেন। এটাই ই-মেইল!

ই-মেইল (e-mail) হলো "ইলেকট্রনিক মেইল" এর সংক্ষিপ্ত রূপ। এটি একটি ডিজিটাল বার্তা বা চিঠি, যা ইন্টারনেটের মাধ্যমে দ্রুত এবং সহজে প্রেরণ ও গ্রহণ করা যায়।

ই-মেইল কীভাবে কাজ করে? ই-মেইল নেটওয়ার্ক সিস্টেমের মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট ই-মেইল ঠিকানায় বার্তা পাঠানো হয়, যা সার্ভারের মাধ্যমে গন্তব্যে পৌঁছে। এটি সম্পূর্ণভাবে ইন্টারনেটের ওপর নির্ভরশীল।

ই-মেইলের উপাদান

1. **ই-মেইল ঠিকানা:**

- এটি একটি ইউনিক অ্যাড্রেস যা প্রাপককে সনাক্ত করতে সাহায্য করে।
- উদাহরণ: **username@gmail.com**
  - **username:** ব্যবহারকারীর ইউনিক নাম।
  - **@:** "অ্যাট" প্রতীক।
  - **gmail.com:** ডোমেইন নাম।

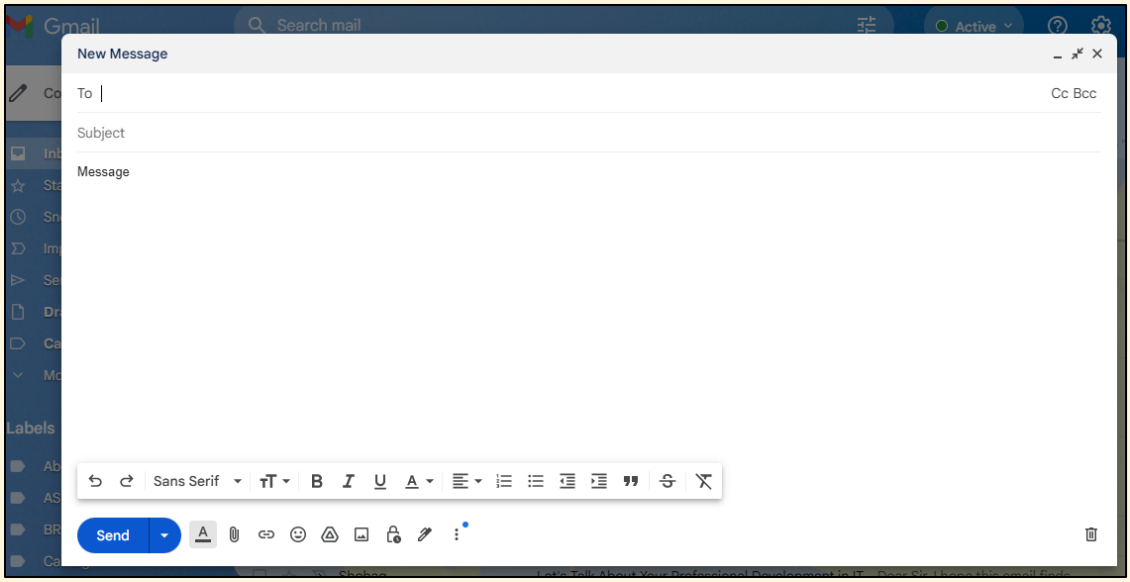

2. **সাবজেক্ট (Subject):**
   - ই-মেইলের মূল বিষয়বস্তু এক লাইনে উল্লেখ করা হয়।
3. **বার্তা (Message):**
   - প্রধান অংশ যেখানে মেইলের তথ্য বা বার্তা লেখা হয়।
4. **ফাইল সংযুক্তি (Attachment):**
   - ই-মেইলে ডকুমেন্ট, ছবি, ভিডিও ইত্যাদি ফাইল সংযুক্ত করা যায়।

ই-মেইলের সুবিধা

- **দ্রুত বার্তা প্রেরণ:** ইন্টারনেটের মাধ্যমে মুহূর্তেই বার্তা পৌঁছে যায়।

- **নির্ভরযোগ্য:** ডেলিভারি নিশ্চিত এবং অটোমেটিক সংরক্ষণ সুবিধা।
- **বিনামূল্যে:** বেশিরভাগ ই-মেইল পরিষেবা বিনামূল্যে পাওয়া যায় (যেমন Gmail, Yahoo Mail)।
- **বহুমুখী:** অফিসিয়াল ও ব্যক্তিগত যোগাযোগের জন্য ব্যবহৃত হয়।
- **ফাইল শেয়ারিং:** ছবি, ডকুমেন্ট, ভিডিওসহ বিভিন্ন ফাইল সহজেই প্রেরণ করা যায়।

ই-মেইল ব্যবহার করতে যা প্রয়োজন

1. **ইন্টারনেট সংযোগ।**
2. **একটি ই-মেইল অ্যাকাউন্ট (যেমন Gmail, Yahoo, Outlook)।**
3. **ডিভাইস (স্মার্টফোন, কম্পিউটার বা ট্যাবলেট)।**

জনপ্রিয় ই-মেইল পরিষেবা

- Gmail (Google)।
- Yahoo Mail।
- Outlook (Microsoft)।

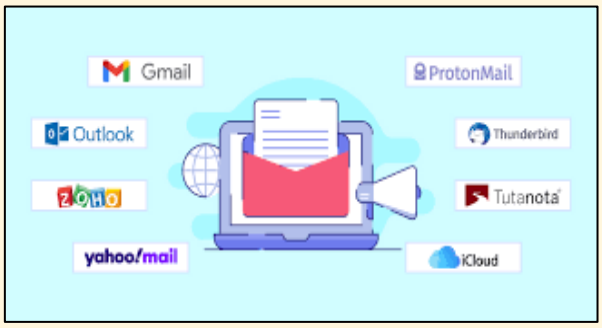

তথ্য আদান-প্রদানের ঝুঁকি

মনে কর, তুমি একটি গুরুত্বপূর্ণ চিঠি ডাকযোগে প্রেরণ করছেন। পথে যদি কেউ সেই চিঠি চুরি করে তার তথ্য ব্যবহার করে, সেটাই তথ্য আদান-প্রদানের ঝুঁকি। ডিজিটাল দুনিয়ায় এটি আরও জটিল, যেখানে তোমার পাঠানো ইমেইল, বার্তা, ব্যক্তিগত বা ব্যাংকিং তথ্য মাঝপথে চুরি হতে পারে।

পারে। ডিজিটাল মাধ্যমে তথ্য আদান-প্রদান করতে গিয়ে তথ্যঝুঁকির ফলে আমরা যেসব বিপদে পড়তে পারি।

1. সাইবার বুলিং (ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে হেনস্তা করা)
2. ব্যক্তিগত গোপনীয়তা নষ্ট হওয়া।
3. পরিচয় নকলকারীর মাধ্যমে প্রতারণার শিকার হওয়া।
4. অপরিণত বয়সীদের কাছে আপত্তিকর ছবি, ভিডিও চলে যাওয়া।
5. অপরিচিতদের কাছে ব্যক্তিগত তথ্য চলে যাওয়া। যা তাদের মাধ্যমে অনাকাঙ্ক্ষিত মানুষের নিকট চলে যাওয়া।
6. নেটওয়ার্ক বা ডিভাইসে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করে তথ্য, ফাইল চুরি, পরিবর্তন বা এর ক্ষতি সাধন (হ্যাকিং)
7. ফিশিং বা নানা প্রলোভন ও প্রতারণার মাধ্যমে ব্যক্তিগত তথ্য যেমন ব্যবহারকারী নাম ও পাসওয়ার্ড, ক্রেডিট কার্ডের তথ্য - ইত্যাদি সংগ্রহ করা।

সাইবার বুলিং বা অনলাইন হয়রানির শিকার যে কারো মানসিক স্বাস্থ্যের অবনতি হওয়ার প্রবণতা দেখা যায়। বিশেষ করে, বিষন্নতা, উদ্বেগ এবং বিচলতার মতো উপসর্গ প্রবল আকার ধারণা করতে পারে। সুতরাং, ইন্টারনেটে তথ্য আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে সতর্কতা জরুরী।

আমাদের দেশে সাইবার বুলিংয়ের বিরুদ্ধে কঠোর আইন রয়েছে, যার মাধ্যমে আপনি সাহায্য পেতে পারেন। সাইবার বুলিং একটি মানসিক চাপ সৃষ্টি করতে পারে, কিন্তু এটি কখনোই আপনার আত্মবিশ্বাস কমিয়ে দেওয়ার কারণ হওয়া উচিত না। **সাইবার বুলিংয়ের শিকার হলে নিজের মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষা করতে- ইতিবাচক চিন্তা এবং আত্মবিশ্বাস বজায় রাখুন, এবং মনে রাখুন, সাইবার বুলিংয়ের শিকার হওয়ার জন্য আপনি দায়ী নন।**

ঝুঁকি কেন হতে পারে?

তথ্য আদান-প্রদানের ঝুঁকি সাধারণত তিনটি প্রধান কারণে হয়:

1. **ডিজিটাল আক্রমণ:**

   হ্যাকার বা সাইবার অপরাধীরা তোমার তথ্য চুরি করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, কেউ তোমার ইমেইল হ্যাক করে তোমার ব্যক্তিগত তথ্য হাতিয়ে নিতে পারে।

2. **ত্রুটিপূর্ণ প্ল্যাটফর্ম:**

   যে অ্যাপ বা ওয়েবসাইট ব্যবহার করছেন, সেখানে যদি নিরাপত্তা দুর্বলতা থাকে, তবে তথ্য ফাঁসের সম্ভাবনা তৈরি হয়।

3. **ব্যক্তিগত অসতর্কতা:**

   যদি তুমি অজান্তে সন্দেহজনক লিঙ্কে ক্লিক করেন বা দুর্বল পাসওয়ার্ড ব্যবহার করেন, তবে তোমার তথ্য সহজেই চুরি হতে পারে।

এ ঝুঁকি কীভাবে রোধ করা যায়?

1. **এনক্রিপশন ব্যবহার করো:**

   তথ্যকে এমন কোডে রূপান্তরিত করো যা শুধু নির্ধারিত প্রাপকই বুঝতে পারে। এটি ঠিক এমন, যেন তোমার চিঠি একটি লক করা বাক্সে রাখা হয়েছে যার চাবি শুধুই প্রাপকের কাছে।

2. **দুর্বল পাসওয়ার্ড এড়িয়ে চলো:**

   পাসওয়ার্ড হতে হবে শক্তিশালী এবং দীর্ঘ। “123456” বা “password” এর মতো সহজ পাসওয়ার্ড ব্যবহার করবে না।

3. **মাল্টি-ফ্যাক্টর অথেন্টিকেশন (MFA):**

   পাসওয়ার্ডের পাশাপাশি তোমার ফোন বা অন্য ডিভাইসের মাধ্যমে অতিরিক্ত নিরাপত্তা নিশ্চিত করো।

4. **বিশ্বাসযোগ্য প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করো:**

   যে অ্যাপ বা সেবা ব্যবহার করবে, তা যেন সুরক্ষিত এবং আপডেটেড হয় তা নিশ্চিত করো।

5. **অপরিচিত ই-মেইল বা লিংক এড়িয়ে চলা:**

   অপরিচিত ই-মেইল বা লিংক এড়িয়ে চলা সাইবার নিরাপত্তার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ই-মেইল প্রেরকের

নাম ও ই-মেইল ঠিকানা ভালোভাবে যাচাই কর। অপ্রত্যাশিত কোনো অফার, লটারি, বা জরুরি বার্তা থাকলে সেটি সন্দেহজনক হতে পারে। URL (লিংক) সন্দেহজনক হলে লিংক ক্লিক না করে ব্রাউজারে সরাসরি টাইপ করে সেই ওয়েবসাইটে যাও।

আইসিটির সুবিধা, চ্যালেঞ্জ ও ভবিষ্যৎ

নীচে অতি সংক্ষেপে আইসিটির সুবিধা, চ্যালেঞ্জ ও ভবিষ্যৎ তুলে ধরা হলো-

আইসিটির সুবিধা:

- **যোগাযোগের উন্নতি:** দূরবর্তী স্থানের সাথে দ্রুত এবং সাশ্রয়ী যোগাযোগ সম্ভব হয়।
- **জ্ঞান এবং শিক্ষার প্রসার:** অনলাইনে বিভিন্ন শিক্ষামূলক কন্টেন্ট সহজলভ্য হয়।
- **কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি:** স্বয়ংক্রিয় প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কাজ দ্রুত ও নির্ভুলভাবে সম্পন্ন করা যায়।
- **ব্যবসা ও ই-কমার্সের প্রসার:** অনলাইন ব্যবসা এবং ডিজিটাল লেনদেনের সুযোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে।
- **দূরবর্তী কাজের সুযোগ:** অনলাইনের মাধ্যমে ঘরে বসেই কাজ করা সম্ভব হচ্ছে।

চ্যালেঞ্জ:

- **সাইবার নিরাপত্তা:** হ্যাকিং, ফিশিং এবং ব্যক্তিগত তথ্য চুরির ঝুঁকি থাকে।
- **বৈষম্য বৃদ্ধি:** আইসিটির সুযোগ থেকে অনেক মানুষ এখনও বঞ্চিত।
- **বেকারত্ব বৃদ্ধি:** স্বয়ংক্রিয় প্রযুক্তির ফলে কিছু চাকরি বিলুপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা।
- **সঠিক ব্যবহারের অভাব:** অনলাইনে তথ্যের অতিরিক্ত এবং ভুল ব্যবহারের কারণে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়।

ভবিষ্যৎ:

- **কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (Artificial Intelligence):** কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই প্রযুক্তি আরো উন্নত হবে, যা সিদ্ধান্ত গ্রহণ থেকে শুরু করে দৈনন্দিন কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।
- **ইন্টারনেট অফ থিংস (IoT):** বাড়ি, গাড়ি এবং অফিসে আইওটি প্রযুক্তি প্রচুর ব্যবহৃত হবে।
- **ডিজিটাল শিক্ষার সম্প্রসারণ:** অনলাইন শিক্ষার সুযোগ আরও সহজলভ্য হবে।
- **ডিজিটাল অর্থনীতি:** ক্রিপ্টোকারেন্সি ও ডিজিটাল ব্যাংকিং বৃদ্ধি পাবে।
- **ডাটা সুরক্ষা:** সাইবার নিরাপত্তায় আরও উন্নত প্রযুক্তি প্রয়োগ করা হবে।

আইসিটি সমাজে ব্যাপক উন্নয়ন আনলেও এর সঠিক এবং নিরাপদ ব্যবহারের উপর গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন, যাতে সকলের জন্য এর সুফল নিশ্চিত করা যায়।

একই সিরিজের আরো বই সমূহ

- কম্পিউটার হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার
- কম্পিউটার নেটওয়ার্কিং
- কম্পিউটার প্রোগ্রামিং ও ডাটাবেজ
- সাইবার সিকিউরিটি ও ক্লাউড কম্পিউটিং
- ই-কর্মাস
- সবুজ ডিজিটালাইজেশন
- ইন্টারনেট অব থিংস (IOT)
- কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, চ্যাটজিপিটি ও ভবিষ্যৎ
- রোবট ও মেশিন লার্নিং
- ভার্চুয়াল রিয়্যালিটি এবং অগমেন্টেড রিয়্যালিটি
- ব্লক চেইন
- কোয়ান্টাম কম্পিউটিং
- তথ্যপ্রযুক্তিতে অন্ট্রাপ্রেনিওরশীপ ও সোশ্যাল বিজনেস
- তথ্যপ্রযুক্তিতে ফ্রি-ল্যান্সিং

ICT OLYMPIAD®
BANGLADESH
Empowering Future with Technology